মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে দক্ষতা গঠন এবং উন্নয়নে সেবা প্রদানকারীদের অনলাইনের মাধ্যমে আত্ম প্রশিক্ষণের মডিউল

অধিবেশণ ১: স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য

এই সেশন শেষে আপনি-

১. মানসিক স্বাস্থ্যের সংগে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।

২. জানতে পারবেন, কি কি অবস্থা দেখে বোঝা যেতে পারে আপনি মানসিক ভাবে ভালো আছেন

৩. শরীর ও মন যে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত তা বুঝতে পারবেন

৪. মানসিক সমস্যা এবং মানসিক রোগের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারবেন

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা আসলে বেশ ব্যাপক এবং অল্প কথায় এটাকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। শুধুমাত্র মানসিক রোগের অনুপস্থিতি মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশ করে না। মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির কাজে, তার চিন্তায়, আবেগীয় অবস্থায় এবং তার সামাজিক কর্মকান্ডে।

স্বাস্থ্য

মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় যাওয়ার পূর্বে দেখা যাক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৪৬ সালের সংবিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী “স্বাস্থ্য হলো এমন এক অবস্থা যা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক এই তিনটির সুস্থ সমন্বয়। এটি শুধুমাত্র অসুস্থতার অনুপস্থিতি নির্দেশ করে না।”

স্বাস্থ্যের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে সুস্থতার ক্ষেত্রে শারীরিক স্বাস্থ্যের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য, তাই মানসিক স্বাস্থ্যকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

মানসিক স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা প্রদানের পাশাপাশি, বিশ্ব স্বাস্থ্য (**WHO**) মানসিক স্বাস্থ্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (**WHO**) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "মানসিক স্বাস্থ্য" হলো জীবনে ভাল থাকার এমন একটি অবস্থা যেখানে

-মানুষ নিজের ক্ষমতাগুলোকে বুঝতে পারে,

-জীবনের সাধারণ চাপমূলক অবস্থার সাথে মোকাবেলা করতে পারে

-উৎপাদনমূলক এবং ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারে

-এবং তার নিজের কমিউনিটির জন্য অবদান রাখতে পারে।

অর্থাৎ এটি সামাজিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং আবেগীয় অবস্থার একটি ভারসাম্যপূর্ন অবস্থা। যেখানে সে তার নিজের নিজের বিভিন্ন আবেগীয় অবস্থার (যেমন: রাগ, দু:খ, হিংসা, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি) উপর নিয়ন্ত্রন রাখতে পারে এবং নিজের ক্ষমতা ও প্রবণতাসমূহের সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটাতে পারে এবং কার্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে"।

স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে বসে যেমন অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার আলোচনায় আটকে পড়লে চলেনা, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও আলোচনা করতে গিয়েও মানসিক অসুস্থতা ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি বা চিকিৎসার মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অসুস্থতাকে হরহামেশাই গুলিয়ে ফেলতে দেখা যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের কতগুলো নির্দেশক রয়েছে, এগুলো হলো:

১) মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি কখনও রাগ, ভয়, দু:খ, আনন্দ, হিংসা, অপরাধবোধ, ভালোবাসা ইত্যাদির কাছে পরাজিত হয় না।

২) এরা এদের অক্ষমতাকে সহজে মেনে নিতে পারে।

৩) এরা আত্ম-সম্মানবোধ সম্পন্ন।

৪) এরা বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

৫) নিজেদের ক্ষমতাগুলোকে এরা সঠিকভাবে মূল্যয়ন করতে করে।

৬) অন্যদের সাথে এদের সম্পর্কগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং কার্যকর হয়।

৭) এরা নিজেদের সমাজের একটা অংশ মনে করে।

৮) এরা বিপদের সময় বসে না থেকে, বিপদকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।

৯) এরা নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহন করতে পারে।

১০) এরা নিজেদের কাজের দায়িত্ব নেয় এবং অন্যদের প্রতি তাদের দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না।

১১) জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব থাকে।

মানসিক সমস্যা এবং মানসিক রোগ

যখন দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলতে থাকে, ফলশ্রæতিতে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয় এবং বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায়, ব্যক্তি মানসিক ভাবে অসুস্থ, তখন বলা যায় যে ব্যক্তি জটিল মানসিক রোগে ভুগছে। বেশিরভাগ মানুষই জটিল মানসিক রোগে ভোগেনা, কিন্তু অনেকেই কোন এক ধরনের মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির নানা ধরনের ভোগান্তি হয় কিন্তু বাহির থেকে তাদের সমস্যাটি প্রকটভাবে বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপিষ্ট বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের সেবা।

মানসিক অসুস্থতা বা রোগ

মানসিক অসুস্থতা বা রোগ বলতে সাধারণত বোঝায় "আচরনের অস্বাভাবিক এবং অসহনীয় এক অবস্থা যা উপযোজনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে"। মানসিক অসুস্থতা বা মানসিক রোগ বলতে জটিল মানসিক রোগ যেমন স্কিজোফ্রেনিয়াকে বোঝায়।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগের মধ্যে পার্থক্য

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হলো এই যে, মানসিক অসুস্থতার অনুপস্থিতি সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশ করে না। মানসিক স্বাস্থ্যের অর্থ আরও ব্যাপক, মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য মানসিক রোগ না থাকা শুধুমাত্র একটি বিষয়, এর বাইরে আরো কিছু বিষয় অর্জন করা দরকার, যা মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শরীর ও মন-পর¯পরের সাথে সম্পর্ক

আমরা সবাই জানি, শরীর ও মন পর¯পরের সাথে স¤পর্কিত। শরীর খারাপ থাকলে মন ভালো থাকেনা, আবার মন খারাপ থাকলেও শরীরের উপর তার প্রভাব পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, শারীরিক অসুস্থতার পিছনে মানসিক অনেক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক অসুবিধার ফলস্বরূপ বিভিন্ন রকম মানসিক উপসর্গ দেখা যায়। তাই বলা যায়, শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে মানসিক উপাদানগুলো কারণও হতে পারে আবার ফলাফলও হতে পারে। কাজেই মানসিক উপাদান গুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা শারীরিক অসুস্থতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে আমাদের জীবন প্রণালী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের স্বাস্থ্যেও জন্য হুমকিস্বরূপ। যেমন-ধূমপান, অধিক মাত্রায় মদ্যপান, অধিক মাত্রায় ঔষধগ্রহন, ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক অনুশীলনের অভাব, এই ব্যপারগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। জীবন প্রণালী ছাড়াও ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারা, রোগের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি- রোগের সাথে সে কিভাবে মোকাবেলা করছে-ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে ভ‚মিকা পালন করে। এছাড়াও আছে ব্যক্তির মনোযোগ, মনোভাব,আবেগ, ব্যক্তিত্ব- যা শারীরিক অসুস্থতার অনুধাবনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যে ব্যক্তি মনে করে "এই অসুখ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে"-তার চাইতে যাদের বিশ্বাস হলো, "আমি এই অসুখ থেকে মুক্ত হতে পারব না" তারা মানসিক দিক থেকে রোগের সাথে ভালো অভিযোজন করতে পারে। আবার কেউ কেউ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা তার রোগকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার কথা বলা যেতে পারে। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরে বা মাথায় তীব্র ব্যথা হলে ঔষধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকি। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কম লোকই ঘুমাতে পারেন, উপরন্তু ব্যথা নিয়ে বিভিন্ন দ:ুশ্চিন্তা করেন- যা ব্যথার মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যেসব মানসিক উপাদান ব্যথার অনুভুতিকে বাড়িয়ে দেয় তাহলো উত্তেজনা, মানসিক চাপ ও দু:শ্চিন্তা, মনখারাপ, হতাশা ও বিষণœতা এছাড়াও আছে-ব্যথার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ, ক্লান্তি, একঘেয়েমী কাজকর্ম করা, আলস্যে অবসর কাটানো। আমরা সবাই কম বেশি জানি যে, উচ্চ রক্তচাপ রক্তে চর্বির আধিক্য, অতিরিক্ত কাজের চাপ, ক্লান্তি, শারীরিক পরিশ্রম না করা ইত্যাদির সাথে হৃদযন্ত্রের সুস্থতা জড়িত। তবে এর পাশাপাশি আর একটি বিশেষ আচরণ পদ্ধতি হৃদরোগের সম্ভাব্যতা বাড়ায়-

যার নাম- "টাইপ- এ বিহেভিয়ার" (ঞুঢ়ব অ ইবযধারড়ৎ চধঃঃবৎহ: ঞঅইচ) টাইপ- এ বিহেভিয়ার প্রধানত ঃ

<u>তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে</u>

১. এরা খুব প্রতিযোগী মনোভাবপন্ন এবং সব কাজে সফলতা চায়।

২. এদের সব সময় মনে হয় সময় খুব দ্রæত চলে যাচ্ছে তাই তারা অল্পসময়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে চায় যা তার জন্য চাপ পূর্ণ।

৩. এরা খুব সহজেই রেগে যায়, কেউ কেউ প্রকাশ করেন, কেউ করেন না।

এবার জানা যাক, এই আচরণ ধারা কিভাবে হৃদরোগের সাথে যুক্ত?

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত যে উত্তরটি পাওয়া গিয়েছে তা হলো এই স¤পর্কের পেছনে প্রধানত যে কারণটি রয়েছে তা হচ্ছে এ ধরনের মানুষের সার্বক্ষণিক অধিক চাপের মধ্যে থাকা। ব্যক্তি যখন চাপমুলক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে তখন তার শরীর উদ্দীপ্ত হয় এবং কিছ ুহরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন শরীরের বিভিন্ন অংশকে এই চাপের মোকাবেলা করতে সচল রাখে। আর বিভিন্ন অঙ্গকে সচল রাখতে রক্ত সঞ্চালন বেশি হওয়া প্রয়োজন যা বজায় রাখতে হৃদপিন্ড অধিক হারে ¯পন্দিত হয়। এই অবস্থা দীর্ঘক্ষন ধরে চলার ফলে হৃদপিন্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলস্বরূপ যারা টাইপ এ আচরণ করে থাকেন তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে।

ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্যান্সার হওয়ার আগে তাদের অনেক চাপমূলক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সে যদি তার চাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে হয়তো ক্যান্সারের মতো জীবন নাশকারী রোগকে নিয়ন্ত্রন করতে পারত। আবার দেখা যায়, ক্যান্সার, ডায়বেটিস এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রথমবার শনাক্ত হওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষে এই সত্য গ্রহণ করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা যেমন-হতাশা, উদ্বিগ্নতা, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, কাজকর্মে উৎসাহ কমে যাওয়া, সবকিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখা,ঔষধ গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এইসব মানসিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে এই রোগের সাথে মোকাবেলা করতে সাহায্য করা যায়।

এতক্ষণে আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে শারীরিক সুস্থতার শারীরিক উপাদানগুলোর পাশাপাশি মানসিক উপাদানগুলোকেও আমাদের গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং এসব উপাদান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে।